***Pratidhwani the Echo***
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
*Volume-IV, Issue-III, January 2016, Page No. 15-23*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# জীবন শিল্পী ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

**লাল্টু মণ্ডল**
*গবেষক, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ. পি., ভারত*

***Abstract***

*The world of literature has seen many a gem in the first phase of the twentieth century and Manik Bandopadhyay most definitely was one of them. Imbued in the caustic sap of hyper-real life and world, Bandopadhyay`s fiction caters to the generations of a state struggling and striving for its identity in the matrix of confusing modern complexities. His fiction occasioned a new narrative revolution in the mosaic of Bengali literature. He announced his arrival at the literary sphere with his first novel janani (1935) and his first collection of short stories Atasi mami ( published in the same year) ; his first novel of note was Dibaratrir Kabya (1935) followed by Padma Nadir Majhi and Putulnacher Itikatha (both published in 1936). This paper seeks to study how Bandopadhyay has narrated the complex configurations and relations in the lives of his characters in ways that appeal to the existential angst of modern life.*

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনকে দেখেছেন বাস্তব ভূমিতে দাঁড়িয়ে, বাস্তবের গভীরে ঝাঁপ দিয়ে তিনি জীবনের জটিলতাকে ধরতে চেয়েছেন। অভ্যস্ত জীবনযাত্রার শৃঙ্খলের মধ্যে নয়, দুর্দমনীয় জীবনপ্রবাহের মধ্যে তিনি জীবনের রহস্য অনুসন্ধান করেছেন। জীবনের জটিলতা ও গভীরতা অন্বেষণে সব সময় তৎপর ছিলেন তিনি; আর সে কারণেই আপাতসিদ্ধিকে পেছনে ফেলে সত্যকে জানবার ব্যাকুলতায় তিনি এগিয়ে গেছেন। উপন্যাসের প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি নিয়ে বার বার তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। বাস্তব জীবনকে তার পরিবেশসমেত তুলে ধরতে চেয়েছেন বলেই সস্তা রোমান্টিকতা, আবেগ বিহ্বলতা ও ভাববাদকে পরিত্যাগ করে তিনি বস্তুবাদকে, বিজ্ঞানদৃষ্টিকে, মানব জীবনের অর্থনৈতিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে-মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছেন। একটা প্রকাণ্ড জড়প্রকৃতি মানুষের জীবনকে চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। জড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে যে চৈতন্য, সেই চৈতন্যের বিকাশ তিনি দেখাতে চেয়েছেন, অনুভব করেছেন এই জড় প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষ পরাজিত হয় কিন্তু মানুষের সংগ্রাম থেমে যায় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমনি একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিল্পী যিনি নৈর্ব্যক্তিক ভাবে মৃত্যুকে রূপ দিতে চেয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। এ মৃত্যু জীবনেরই অপর পিঠ। কারণ মৃত্যুর উপলব্ধি না থাকলে জীবনকে উপলব্ধি করা যায় না।

জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কোন শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র স্বয়ংনির্ভর বিষয় নয়। এটা পরিস্ফূট হয়ে ওঠে সেই শিল্পীর নিজের দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে। তাই একজন লেখকের মানস প্রবণতা নির্ধারণ করতে হয় তার সমকালীন জীবন ও সাহিত্যের পটভূমির অনুসঙ্গে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন প্রবাহিত হয়েছে এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবন সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতের ক্ষুব্ধ ফেনিলতায়। সময়টি বিশ শতকের প্রথমার্ধ। এ সময়ে পুরানো পৃথিবীর প্রচলিত ঐতিহ্য আর বিশ্বাস, মনন আর মূল্যমান, একটা প্রচন্ড ভাঙন রূপান্তরের মুখোমুখী। পশ্চিমা সভ্যতার নতুন প্রাণকল্লোলে বিপরীতমুখী চিন্তা আর তত্ত্বের সংঘাতে উদ্বেল উত্তাল ভাবকন্যা। দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে সামাজিক আর নৈতিক জীবনের প্রতিক্রিয়া। পাশাপাশি মার্কসীয় বৈপ্লবিক সাম্যনীতি আর ফ্রয়েডিয় যুগান্তকারী যৌনতত্ত্বের আলোড়ন। পুরানো পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের স্বপ্ন আর স্থির নিশ্চিন্ত আদর্শের সৌধে ফাটল ধরিয়েছে। একদিকে মানুষের ভাবজীবনের এই বিক্ষোভের ছবি, অন্যদিকে বহির্জীবনের শিল্পবিপ্লবের ফলে

যন্ত্র- যুগের ক্রম-প্রসারের চিত্র। এরই ফলশ্রুতিতে সভ্যতার ভারকেন্দ্র সহজ গ্রামজীবন থেকে ক্রমশ সরে এসেছে নাগরিক জীবনে, যন্ত্রবদ্ধ কৃত্রিম নাগরিক পরিবেশে। এসময়ে মানুষ সংশয়ান্বিত হয়েছে পুরানো ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার আর নীতিবোধ সম্পর্কে। যুক্তির মর্মভেদী আলোতে তারা সব কিছুকে নতুন করে যাচাই করতে শুরু করেছে। দারিদ্র্যের মধ্যে ত্যাগের মহিমাকে তারা মানতে রাজী নয় কিংবা প্রেমের নামে কোন অলৌকিক ভাববিহ্বলতার চেতনায় বিহ্বল হয়ে পড়ে না। সমস্ত কিছুকেই সাদা চোখে দেখবার, যাচাই করবার নেশায় এ সময়ের মানুষ মেতে উঠেছে। এই সংশয়-জিজ্ঞাসা, বুদ্ধিজীবি মানুষের আদর্শের দ্বন্দ্ব, বিক্ষোভ, হতাশা, তীব্রতর হয়েছে রাজনৈতিক সংগ্রাম চেতনা। মানুষের মন সমাজ ও যুগচিন্তার আঘাতে আঘাতে জর্জরিত বিক্ষুব্ধ হয়েছে বহু বিচিত্র ভাবে।

সাহিত্যকে বলা হয় জীবনের দর্পণ। সেখানে যুগ ও জীবনের ছবি নানারঙে, নানারূপে নিরন্তর আত্মপ্রকাশ করে মানিকের জীবনচেতনার মধ্যেও স্বাভাবিক ভাবে তাই ফুটে উঠেছে যুগ ও জীবনের অবক্ষয় আর সংশয়-জিজ্ঞাসার ছবি। অখন্ড ও সমগ্র জীবনকে দর্শন করতে চেয়েছেন তিনি আর তাই জীবনকে কখনও দেখেছেন ফ্রয়েডীয় যৌন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কখনও মার্কসীয় সাম্যবাদের দৃষ্টিতে। তাঁর জীবনদৃষ্টিতে প্রখর বাস্তবতা ছিল কিন্তু আশাহতের কিংবা আদর্শবাদীর স্বপ্নভঙ্গের বিহ্বলতা ছিল না।

তাঁর জীবনদৃষ্টি ছিল সমাজ ও যুগচেতন এবং জগত ও জীবনের বিচিত্র উপকরণে সজ্জিত। তাঁর জীবন চেতনার মধ্যে হয়ত যুগের রুগ্নতা বিকৃতরূপ ও বিকলাঙ্গ চেহারার ছায়াপাত ঘটেছে কিন্তু তাই বলে সেখানে খন্ডিত একদর্শিতা কখনোই ঠাঁই পায় নি। এখানেই মানিক তার সমকালীন শিল্পীদের থেকে আলাদা। অর্থহীন ভাবোচ্ছ্বাস ও শ্বাসরোধকারী Morbid আবেগ তাঁর সাহিত্যে স্থান পায় নি।

বিশ শতকের দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অপ্রতিহত গতিতে চলছিল। বাংলা সাহিত্য মনে মনে এই এক ঘেয়েমির একটা অবসান কামনা করছিল। কামনা করছিল এর চলার পথে একটা নতুন মোড়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত তাদের সেই আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করেছে। যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের প্রবণতা হল রবীন্দ্র প্রভাবকে পরিহার করা ও নতুন ভাব ব্যঞ্জনায় সাহিত্যে যুগের সংকটকে চিত্রিত করা। এমনি সময়ে প্রাচীনতার সমাধি রচনার প্রকল্পে নবীন সাহিত্য গোষ্ঠী এগিয়ে এলেন 'কল্লোল'(১৯২৩) পত্রিকার মাধ্যমে। এতদিন পর্যন্ত আমাদের কথাসাহিত্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা গিয়েছিল তার মূলে ছিল ধর্ম, পরিবার বা সমাজের সংস্কারজাত বাধা। কিন্তু এই নতুন যুগের গল্পে যা কিছু দ্বন্দ্ব, যা কিছু সংকট সবই সদ্যোভূত অর্থনৈতিক সংকট। আঘাত মানুষকে প্রত্যাঘাত করতে শেখায়। যুদ্ধের ভয়াবহতা ও শোষিত জীবনের বঞ্চনা মানুষকে অধিকার সচেতন করেছে, করেছে প্রতিবাদমুখর এবং সাম্যবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ। যুদ্ধের অভিঘাতে সমাজ যেন আলোড়িত হয়েছে, তেমনি সমাজের আলোড়নে সাহিত্যও পেয়েছে একটি অভূতপূর্ব গতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উদ্ধত যৌবনের উদ্দামতা নিয়েই কল্লোল গোষ্ঠীর তরুণ লেখকসমাজ, জীবনবাদের বিদ্রোহের শ্লোগানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। 'কল্লোলের' এই কোলাহলে বাঙালী একটা উত্তেজক ধ্বনি শুনতে পেয়েছিল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে লিখেছেন-

'রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল'। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে কয়লা কুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়'। [১]

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে মানুষ নানারকম মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল। এই ব্যাধির উৎস ও প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করতে করতে ফ্রয়েড চেতনালোকের নীচে এক অবচেতনলোকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। অবদমিত যৌন প্রবৃত্তি যে সমাজের মধ্যে বিকৃত পথে বিকাশ লাভ করে তার বিচিত্র তথ্য উদ্ঘাটিত করে ফ্রয়েড, ইয়ং প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের জগতে এক নবযুগের দ্বার উন্মোচিত করেন। তাঁদের নব আবিষ্কৃত তথ্যগুলো কল্লোলীয়দের রচনায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। মানিক বন্দ্যো পাধ্যায় কালের দিক থেকে কল্লোলের সমকক্ষ ; কিন্তু তাই বলে তাঁকে ঠিক 'কল্লোলের কুলবর্ধন ' বলা যাবে না। কারণ অন্যান্যদের তুলনায় মানিকের জীবন চেতনা ছিল ভিন্ন ধরণের। তিনি অত্যন্ত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী এবং একজন বৈজ্ঞানিক জীবন-সমালোচক। 'তারাশংকর যদি বাংলা সাহিত্যকে Space দিয়ে থাকেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন depth. মগ্নচৈতন্য থেকে জাগার চৈতন্য, মনঃসমীক্ষা থেকে সাম্যবাদে-এ যুগের আবিষ্কৃত সব কয়টি দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে তিনি দেখলেন ভেঙ্গেচুরে প্রায় পিকাশোর মত, ডষ্টয়ভস্কীর মত-মানুষের রূপের বিভিন্ন তল

ফুটে উঠল তাঁর উপন্যাসে। বলা বাহুল্য তাঁদের বিস্ময়কর কিছুটা ভীতিকর বৈপরীত্য নিয়ে। মৃত্যুর থেকে জন্মের দিকে যাবার আকাঙ্খাই তাঁর সমগ্র সাহিত্যের মূল কথা।"[২]
শ্রীসন্তোষ কুমার ঘোষ যথার্থই বলেছেন-

'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে আসল ব্যাপার হল তাঁর নিজের চোখ। একেবারে জ্বলজ্বলে ড্যাবডেবে একজোড়া চোখ। বোধহয় তার রঞ্জনরশ্মিও ছিল, এমন আনকোরা নতুন চোখে জীবনকে তার আগে কেউ দীর্ঘকাল দেখেননি। আমাদের সমাজ, পরিবার, প্রেম যুক্তি বিশ্বাস সব কিছু দেখবার ধরণ আগাপাশতলা বদলে গেল। বিনা প্রশ্নে কোন তথ্যই আমরা আর গ্রহণ করিনি। সব ঘষে ঘষে যাচাই করে তবে রাখা আর না রাখা। অনেক কিছু যে অচল, তখন থেকেই ঠিক এতটা ডাহা ভাবে বোঝা গেল। প্রথম বুঝিয়ে দিলেন মানিক, তাঁর ওই চোখ দু'টো দিয়ে। বলতে কি আমার মনে হয় মানিকের পর বাংলা সাহিত্যে শরীর বদলেছে, সাজগোজ ঘটেছে অনেক কিছু। কিন্তু ওই দু'টি চোখ ? তারপর নতুন চোখ আর এলনা, এখনো আসেনি'।[৩]

মানিক বন্দ্যোপাধায় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জননী' থেকেই চরিত্র নির্মাণে নিজস্ব রীতি অবলম্বন করেছেন। প্রথম থেকেই তিনি সচেতন ছিলেন যে, ব্যক্তি সমাজ বিচ্যুত কোন বিমূর্ত সত্তা নয়। তিনি জানতেন যে পটভূমি, পরিপ্রেক্ষিত-সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ-স্বয়ং সম্পূর্ণ অলংকরণ নয়, তা চরিত্র ব্যক্তি হয়ে ওঠার পথে জরুরী। লেখক হিসাবে ব্যক্তি চরিত্রের প্রতি মানিক ছিলেন পক্ষপাতশূন্য, আবেগ বিষয়ে নির্বিকার। ব্যক্তি রূপায়নে ও পরিবর্তনে অর্থনৈতিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি ছিলেন সচেতন। দৃশ্য ও আচরণ জগতের সব কিছুকে যাচাই করে দেখার Espial প্রবণতা তাঁর ছিল-এটিকেই বলা হয়েছে তাঁর 'আনকোরা নতুন চোখ।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রসঙ্গক্রমে 'কল্লোলযুগের' কথা যেমন অনিবার্য ভাবেই ওঠে আসে, তেমনি রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশ গুপ্তের কথাও এসে যায়। 'কল্লোল' ও জগদীশ গুপ্তকে ছাড়িয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রা শুরু।

বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসে আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এখানেই বাংলা উপন্যাসের মোড় ঘুরেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পথ ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ এক নতুন পথে যাত্রা করেছেন-সে পথ বাস্তবতা বা Realisam-এর পথ। বিহারী-বিনোদনীর বাস্তবতার পথে আত্ম-উদ্‌ঘাটন ও আত্ম-আবিষ্কারের মধ্যেই বাংলা উপন্যাসের মোড় ফেরার সংকেত ধ্বনি বেজে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসকে শুধুমাত্র Realisam-এর পথে চালনা করেই ক্ষান্ত হননি। 'চোখের বালি' উপন্যাসে তিনি যে চরিত্র নির্মাণের সূচনা করেছেন মহৎ উপন্যাস 'গোরা'(১৯০৯) তে তার পরিণতি ঘটিয়েছেন। এখানে তিনি চরিত্রকে অস্তিত্বের সমস্যার কেন্দ্রে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। 'গোরা' একাধারে ভারত ভাবনার রূপায়ণ ও জীবনধর্মী কাহিনী। তাই এই উপন্যাসটি মহৎ হয়েও চরিত্র নির্ভর ও জীবনধর্মী। বাস্তবতার সাথে এখানে আদর্শবাদের মিলন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ এরপর আরো এগিয়ে গেছেন সামনের দিকে। বাস্তবতা ও রোমান্টিক আদর্শবাদ পেরিয়ে তিনি জীবনের অন্তঃ বাস্তবতায় (Reality) পৌঁছে গেছেন।

এই শতাব্দীর সূচনা পর্বেই (চোখের বালি ১৯০৩) বাংলা উপন্যাস চরিত্র প্রধান হয়ে উঠেছে। 'গোরা'র পরে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বিস্ময়করভাবে আধুনিকতায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ব্যাপক প্রভাবে অনেকেরই তা নজরে পড়েনি। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে। বাংলা উপন্যাসের বিবর্তনে এই গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। এখানেই প্রথম বাঙালি পাঠক জানতে পেরেছেন চরিত্রের বিবর্তন কি ? চরিত্রের বিবর্তন হল কোন চরিত্রের নিঃশর্ত স্বাধীন বিবর্তন ওরফে চরিত্রের জন্মান্তর। 'চতুরঙ্গ' একটি শচীশের কাহিনী নয়। নানা শচীশের কাহিনী। শচীশের অনেক জন্ম অনেক মৃত্যু ঘটেছে শচীশ জীবনের একটি ছক আশ্রয় করেছে। অনতিবিলম্বেই তাকে ভেঙে ফেলে নতুন একটি ছক আশ্রয় করেছে এবং পরমুহূর্তেই তাকে পরিত্যাগ করে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। দামিনীও তাই করেছে। বাংলা উপন্যাসে এ দুই চরিত্র প্রথম আধুনিক চরিত্র।' [৪]

এই উপন্যাসটিতে রবীন্দ্রনাথ তিনটি আধুনিক উপায় অবলম্বন করেছেন-এর ব্যবহারও বাংলা সাহিত্যে প্রথম। অবচেতন, প্রতীক ও সংলাপকে তিনি চরিত্রের নিঃশর্ত স্বাধীন বিবর্তন ঘটতে ব্যবহার করেছেন। 'দিন ও রাত্রির', 'স্থল ও জলের' মোহনায় চরিত্রের জন্মান্তর সাধিত হয়েছে। ইন্দ্রিয় নির্ভর অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে অবচেতনের অনুভূতিতে শচীশের বার বার

প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। শুধু তাই নয়, নির্বিশেষকে সে বিশেষ রূপে পেতে চেয়েছে, বিশেষকে অতিক্রম করেই নির্বিশেষে যেতে চেয়েছে।
'অন্ধকার গুহা, জীর্ণ বাড়ি, স্থলভাগের ক্লান্ত হাতের মতো অন্তরীপ, অচেনা জন্তুর চাপা কান্না, দুর্যোগের রাতে মনের জানালা, দরজার ছিটকানি খুলে যাওয়া, মনের ভিতরে জড়ের প্রবেশ ও মনের ভদ্র আসবাবপত্রগুলোর উলোট পালোট এই সব প্রতীক অবচেতনের জগৎকে এ উপন্যাসে অবয়ব দিয়েছে।

সংলাপ এখানে হয়ে উঠেছে চরিত্রের দর্পণ, যে কারণেই ; চতুরঙ্গে' সংলাপের উপর এত জোর পড়েছে। চেতন-অবচেতনলোকে চরিত্রের যাত্রার ইঙ্গিত বহন করে বলেই ভাষা হয়েছে প্রধাবিত, উজ্জ্বল এবং জটিল।'[৫]

Stream of consciousness বা চেতন-প্রবাহের শিল্পরূপ যে Interior monologue তার ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে অত্যন্ত নিপুণতার সাথে দেখিয়েছেন শচীশ ১০ অনুচ্ছেদে। রবীন্দ্রনাথ বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলা উপন্যাসে নতুন রীতি যখন প্রবর্তন করেন-ঠিক সেই সময়ে ইংরেজী উপন্যাসেও নতুন রীতি প্রবর্তিত হচ্ছিল। জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, অলডাস হাক্সলি, ড্রয়োথী রিচার্ডসন প্রমুখ ঔপন্যাসিকগণ নতুন রীতির উপন্যাস রচনায় ব্যস্ত।
রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত এই আধুনিক রীতি 'কল্লোল' 'কালিকলম' 'বিচিত্রার' লেখকরা ব্যবহার করেন নি। কেবল মাত্র জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের উপন্যাসে মানব মনের ও জীবনের জটিলতাকে দেখবার প্রয়াস পেয়েছেন। ১৯১৬ সালের দিকে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে যে সুবিপুল শিল্প-সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন, তার ব্যবহার শরৎচন্দ্রের প্রভাবে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। শরৎ-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে জগদীশ গুপ্ত যে নির্মোহ বিজ্ঞান দৃষ্টির প্রবর্তনা করেছিলেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার সার্থক শিল্পী। মানিকের শিল্প-সাফল্য প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের উপন্যাসে যতটা, স্বাধীনতা উত্তর উপন্যাসে ততটা নয়। 'জননী', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'সহরতলী', 'দর্পণ', 'শহরবাসের ইতিকথা'য় যে শিল্প সাফল্য লক্ষ্য করা যায় তা পরবর্তী পর্যায়ে আর দেখা যায় না। বাংলা উপন্যাসে মানিকের প্রভাব তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাসের কারণে। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৩১৬) বস্তুনিষ্ঠ শিল্পভাবনা, নির্মোহ চরিত্র চিত্রণে, জীবনের জটিলতা বিশ্লেষণে বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন।

আমাদের সমাজ, পরিবার, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, ত্যাগ সবকিছুকে দেখার ধরণ পালটে দিয়েছে এই গ্রন্থটি। প্রচলিত মূল্যবোধ ও ধারণা সম্পর্কে প্রবলভাবে নাড়া-দেয় উপন্যাসটি আমাদের মন মানসিকতাকে। বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া, প্রেমের পরিণতি ও রূপান্তর যে কত জটিল তা এখানেই আমরা লক্ষ্য করি।

তারাশঙ্করের বিপরীত পথ ধরেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রা। তারাশঙ্কর সাহিত্য করবার আগেই রাজনীতিতে যোগ দেন। মানিক স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এদেশের নিপীড়িত মানুষের দুর্দশার মূল কারণ খুঁজে বের করতে চেয়েছেন। সাহিত্যজীবন শুরু করার পর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু মার্কসবাদের সাথে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার পর তিনি উপলব্ধি করেছেন যে তাঁর আগের লেখায় 'অনেক ভুল, ভ্রান্তি, মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁক রয়ে গেছে।' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের মুক্তি বলতে বুঝেছেন নিপীড়িত মানুষের মুক্তিকে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেখার দৃষ্টি ও দৃষ্ট ভিন্ন প্রকারের ছিল। তিনি অত্যাচারিত শ্রেণীর মধ্যে শক্তির উন্মেষ লক্ষ্য করেছেন এবং সেই উন্মেষকে সাহিত্যে চিত্রিত করেছেন। এ শক্তির একমাত্র উৎস হচ্ছে উৎপীড়িত শ্রেণীর চেতনা এবং একতা।'[৬]

অন্যান্য ঔপন্যাসিকের মত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানিয়ে চলার লোক ছিলেন না। তিনি মেহনতী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্খী ছিলেন। তাঁর চিন্তাধারার শেষ লক্ষ্য ছিল শোষণমুক্ত রাষ্ট্র। 'এ পর্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাসগুলোতে তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন শোষণের রূপ। মধ্যবিত্তের দূরত্ব অতিক্রম করে জনজীবনের কাছে গেলে যে সত্য সামনে আসে তা তিনি উন্মোচিত করে দেখিয়েছেন। সে সত্যের নাম শ্রেণীসংগ্রাম।'[৭]

এ পর্যায়ের উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন যে প্রচলিত মধ্যবিত্ত আন্দোলনগুলি শ্রেণীস্বার্থ আদায়েরই আন্দোলন। তাঁর বক্তব্য ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়েছে। নিপীড়িত চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে আরও সংগ্রামী। মার্কসীয় দৃষ্টিতে তিনি শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী শক্তির উপর তিনি আস্থা রেখেছেন। নেতৃত্ব প্রসঙ্গে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলঃ 'পরিবেশই নেতার জন্মভূমি। উপযোগিতা ও চাহিদা অনুসারে নেতার অভ্যুদয় যে কোন শ্রেণী থেকেই সম্ভব।'[৮]

অন্যান্য ঔপন্যাসিকের মত মানিক আঙ্গিকপ্রধান উপন্যাস লেখেননি। লিখেছেন বক্তব্য প্রধান উপন্যাস। বৈজ্ঞানিক রূঢ়তার কারণে এবং জীবিকান্বেষণের তাগিদে অতিরিক্ত ব্যস্ততার ফলে লেখা সব সময় শিল্পোত্তীর্ণ যে হয়েছে এমন নয়। ''বাংলা উপন্যাসের ধারায় মানিক যে বক্তব্য উপস্থিত করতে চেয়েছেন সেই বক্তব্যের পক্ষে অবলম্বনযোগ্য ও সহায়ক কোন ঐতিহ্য ছিলনা। তিনি পথিকৃতের ভূমিকা এক্ষেত্রে পালন করেছেন। তাই তাঁর রচনার মধ্যে অনভ্যস্ততা আছে যা শিল্প উৎকর্ষ অর্জনের ক্ষেত্রে ধনাত্মক নয়, ঋণাত্মক।''[৯]

লেখক যে জীবনকে দেখেন সেটা অবশ্যই তাঁর শিল্পকর্মে প্রতিভাত হয় এবং সেই জীবনরস-সমৃদ্ধ শিল্পকর্ম লেখকের বিশিষ্ট মনোভঙ্গীর কথাই ঘোষণা করে। এক্ষেত্রে হেনরি জেমসের বক্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেনঃ 'No good Novel will ever proceed from a superficial mind.'' একথার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে উপন্যাসের শিল্পকর্ম বিচারে লেখকের মানস বিচারই করা হয়ে থাকে। শিল্পকর্ম তথা উপন্যাস বিচারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে আমাদের বিবেচ্য ও আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত :

(ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি পদ্ধতিতে জীবনকে দেখেছেন;
(খ) তিনি জীবন থেকে কি গ্রহণ করেছেন এবং কি বর্জন করেছেন;
(গ) তাঁর সমস্ত বক্তব্য কোন্ নৈতিক বোধে বিশিষ্ট।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে শিল্প সংকটের একটা অনুযোগ শোনা যায়। এ সংকট মূলতঃ তাঁর মতবাদের সংকট। এ সংকটের স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলির বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা করা দরকার। তাঁর 'চতুষ্কোণ' ও 'সরীসৃপ' পর্যায়ের রচনাগুলি ছাড়া 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা' অথবা 'সহরতলী'তে কিংবা 'চিহ্ন', উপন্যাসে যৌনতাকে মুখ্য বিষয় হিসাবে দেখানো হয়নি। 'সহরতলী', 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'চিহ্ন', 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-এ সমস্ত উপন্যাসের প্রধান বিষয় মানুষ। শুধুমাত্র 'চতুষ্কোণে'র মত একটি গ্রন্থের জন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যৌন সর্বস্বতার অভিযোগ আনার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্যায় ও তৃতীয় পর্যায়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে একথা সত্য। কিন্তু এই দুই পর্যায়েই তিনি মানুষের অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। সেগুলিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন, বিচার বিশ্লেষণ করেছেন এবং শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করার সাধনা করেছেন। সুতরাং তাঁর সাহিত্যে জীবন কম যৌনতা বেশী এমনতর অভিযোগ করা লেখকের প্রতি অবিচারেরই সামিল। তাঁর 'পদ্মা নদীর মাঝি' ও 'পুতুল নাচের ইতিকথা' নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে জীবনের দুটো ভিন্ন বিন্যাসে রেখাপাত করা হয়েছে। তিনি জীবনের বর্ণবহুল মুহূর্তগুলিকে পরিহার করে মানুষের হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহের উপরিতলার সমস্ত বিকারগুলিকে পরিত্যাগ করার পক্ষপাতি। সেক্ষেত্রে জীবন-চৈতন্যের গভীরতার প্রশ্নকে তিনি ধরতে চেয়েছেন। তাঁর বিষয় ছিল মানুষের মন আর সে কারণেই ঘটনার চড়া রঙের বর্ণনার চাইতে বরং তিনি মানুষের মনের উপর ঘটনার প্রতিক্রিয়া সন্ধানের জন্য মনোযোগী হয়েছেন। 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় শশীর সমস্যা যৌন সমস্যা নয় বরং তা শশীর মনের সমস্যা। তার সত্তার মূলীভূত সমস্যাই এ উপন্যাসের বিষয়। 'পদ্মা নদীর মাঝি' ও 'পুতুল নাচের ইতিকথা' এ দু'টি উপন্যাসের উপজীব্য হচ্ছে অদৃষ্টের হাতের ক্রীড়নক মানুষের কথা। গাওদিয়ার গ্রাম্য সমাজ এবং পদ্মা নদী এই উপন্যাসদ্বয়ে অদৃষ্টের অন্ধ নিয়তির প্রতীক রূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

'চতুষ্কোণ' এর ক্ষণিক পর্যায় দিয়ে সামগ্রিকভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিচার করে রায় দেয়া ঠিক হবে না। কারণ এই ক্ষণিক পর্যায়ের ফলশ্রুতি বা প্রকার তাঁর অন্য পর্যায়গুলিতে স্থায়ী কোন চিন্তার প্রভাব ফেলেনি। এই গ্রন্থের অব্যবহিত পরের স্তরেই মানিক নতুন করেই মানুষকেই দেখতে চেয়েছেন। মানুষের সমগ্র চেহারাতে তারই সমাজ-প্রতিবেশ ক্রিয়াশীল-এমনি ভাবনা 'চতুষ্কোণে' উপস্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এর পরবর্তী পর্যার্যে মানিক নতুন জিজ্ঞাসায় অগ্রসর হয়েছেন। আর এই নতুন জিজ্ঞাসা তাঁকে মার্কসবাদের কাছে নিয়ে গেছে। তিনি মার্কসবাদকে স্বীকার করেছেন।

প্রথমে ফ্রয়েড অতঃপর মার্কসকে অবলম্বন করে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। কোন্ পর্যায়ে তাঁর সাফল্য ও ব্যর্থতা কতটুকু সে দিকে দৃষ্টিপাত না করে বরং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন থেকে কি নির্বাচন করেছেন ; কোন্ বক্তব্যে পৌঁছাতে চেয়েছেন- অর্থাৎ তাঁর জীবনকে দেখার মনোভঙ্গীটি কি সেদিকে তাকিয়ে বিচার করলেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তর্গত শিল্পী মানুষটিকে আমরা দেখতে পাব। কারণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন থেকে সাহিত্য কর্ম আলাদা নয়। তাঁর জীবনকে খোঁজার জন্য শিল্পীকে খুঁজতে হবে। 'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮) সম্বন্ধে যৌনতার অভিযোগ মোটেই সমীচীন নয়। কারণ মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া-সচেতন জীবনরহস্য-সন্ধানী লেখকের পক্ষে যৌনতার আশ্রয় নেওয়া সম্ভব নয়। 'চতুষ্কোণ'-কে রিরংসার ছবি মনে না করে নায়কের সুস্থ জীবনবোধে প্রত্যাবর্তনের আন্তরিক প্রয়াস-কাহিনীরূপে দেখাই সঙ্গত।

নিষেধ-বিড়ম্বিত সমাজে নরনারীর সুস্থ স্বাভাবিক জীবন পদে পদে ব্যাহত হয়। সে কারণে যৌন জীবনে ও যুবক যুবতীর ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সুস্থতা নেই, আছে সন্দেহ, বিকার, মিথ্যাচার, আর সে কারণেই অসংযম। নায়ক রাজকুমারের দৃষ্টিতে মানিক এই বিচার করেছেন এভাবেঃ- 'কেবল সে একা নয়, সকলেই এই রকম। অনেক পরিবারে পনের বছরের মেয়েরও বাপ ভাই ছাড়া কোন পুরুষের সামনে যাওয়া বারণ। এমন একটি মেয়ে যদি কেবল চুপি চুপি দু'টি কথা বলার জন্যও পাশের বাড়ির ছেলেটিকে ডাকে ছেলেটি কি ভাবিবে ? রিনি চুমু খাওয়ার খানিক আগে সে যা ভাবিয়াছিল। এমন একটা বিকৃত আবেষ্টনীর মধ্যে তারা মানুষ হয়েছে যে, অস্বাভাবিক মিথ্যা ,অসংযমকেই তারা স্বাভাবিক সত্য বলে জানতে শিখেছে। মানুষ কেবল পরের নয়, নিজের সংযমে বিশ্বাস করে না। অসংযমের চেয়ে সংযম যে মানুষের পক্ষে বেশী স্বাভাবিক এ যেন কেউ কল্পনা করতে পারে না। '[১০]

রাজকুমারের এ ভাবনা খুবই যুক্তিযুক্ত। যে অবরুদ্ধ সমাজের আমরা বাসিন্দা 'চতুষ্কোণ ' -এ তারই পরিচয় ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের শুরুতেই যে ঘরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা প্রতীক মাত্র। রাজকুমার ও আমরা সবাই এমনি চার দেওয়ালের অবরোধের মধ্যে যে অস্বাভাবিক জীবন যাপন করছি, তারই প্রতীক এই ঘরটি। শহরে জীবনের জটিলতা আর অস্বাভাবিকতার বিশ্লেষণ এই উপন্যাসের উপজীব্য। রাজকুমার জানতে চায় -''কোন জীবনের উপযোগী এই দেহ, ভিতরের প্রকৃতির কোন পরিচয় আঁকা আছে এই দেহের বাহিরে, কিছুই টের পাওয়া যায় না।' [১১]

এই প্রশ্নের উত্তর রাজকুমার ব্যাকুল হয়ে রিনি গিরি মালতী সরসী রুক্মিনী কালি-এদের মধ্যে অন্বেষণ করে বেড়ায়। নগ্ন নারীদেহ দেখতে চাওয়ার প্রস্তাবে অনেকেই রাগ করে, কেবল রাজি হয় সরসী। সরসীর নগ্ন শরীর দেখে রাজকুমার বলে - তুমি এত সুন্দর। তোমাকে আমি এখন প্রণাম করতে পারি।

শহুরে জীবনের নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা, অস্বাভাবিকতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার ফলে অশান্তি ও অসুখ দেখা দেয়, রাজকুমার তারই প্রতিনিধি। জীবনে অবসাদ ও উদ্যমহীনতা আসলে জীবনবিমুখতা, রাজকুমার তারই স্বীকার। কিন্তু তার তত্ত্বের সমর্থন অন্বেষণ করতে গিয়ে সে জীবনের প্রতি আসক্তি ফিরে পেয়েছে। 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় হারু ঘোষের মৃত্যুতে শশী ডাক্তারের জীবন বৈরাগ্য উপস্থিত হয়নি বরং জীবনটা সহসা তাহার কাছে অতি কাম্য অতি উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়। রাজকুমারের পক্ষে শহুরে জীবনের অস্বাভাবিকতা ও অবসাদকে কাটিয়ে ওঠাতেই জীবন কাম্য ও উপভোগ্য বলে মনে হয়। সরসী কালী শেষ পর্যন্ত অসুস্থ রিনি তাকে জীবনের পথে, দায়িত্ব ও কর্তব্যের পথে, সুস্থ জীবন বোধে ফিরিয়েছে। রাজকুমারে জীবন অন্বেষণ ছিল আন্তরিক। তাই পাগল রিনিকে সেবা করতে গিয়ে তাকে সে বিয়ে করেছে। তার কাছে জীবনটা আর খেলার জিনিস থাকে নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে জীবনের বিকার বা অস্বীকৃতি নয়, জীবনের প্রতি আসক্তিই মানিক বন্দ্যপাধ্যায়ের উপন্যাসের শেষকথা। তিনি জীবনের রহস্য অনুসন্ধান করেছেন দুর্দমনীয় জীবন প্রবাহের মধ্যে, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্যে।

জীবনের প্রতি মমতাবশতঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সব অন্যায় ও বিশৃংখলাকে ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়, গভীর জীবনাসক্তি, তীক্ষ্ণ বাস্তবচেতনতা, প্রখর সামাজিক-অর্থনৈতিক চেতনা আপাত সাফল্যকে ফেলে নতুন পথে হাঁটবার দুঃসাহসিকতা, সত্যনিষ্ঠায় আপন সীমাকে উত্তীর্ণ হবার আন্তরিকতা তাঁকে এমন এক বিশিষ্টতা দিয়েছে যা সব সময় আমাদের সশ্রদ্ধ মনোযোগ দাবী করে। উপন্যাসের স্বরূপ ও তাৎপর্য নির্ণয়ে, প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির নব নব প্রয়োগে, জীবনকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানায় ও সাহিত্যে তার রূপায়ণে, তীক্ষ্ণ সচেতনতা ও আন্তরিকতায় যা সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসেও দুর্লভ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুর নন, জীবনের উপাসক। জীবন শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন দিন মুখোশ পরেননি। তাই তিনি অহংকার করে বলতে পারেন:

ফুলগুলো সরিয়ে নাও
আমার লাগছে।
মালা
জমে জমে পাহাড় হয় ফুল

জমতে জমতে পাথর
পাথরটা সরিয়ে নাও
আমার লাগছে।
ফুলকে দিয়ে
মানুষ বড় বেশী মিথ্যে বলায় বলেই
ফুলের উপর কোনদিনই আমার টান নেই।
তার চেয়ে আমার পসন্দ
আগুনের ফুলকি
যা দিয়ে কোন্দিন কারো মুখোশ হয় না। [১২]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটির মূল সুর জীবনচেতনা। এটাই মানিকের জীবনচেতনার মূল সুর। মৃত্যুচেতনাকে বাদ দিয়ে জীবনচেতনা কখনোই পূর্ণতা পায় না। জীবনের সমগ্রতাকে পেতে হলে মৃত্যুচেতনার সঙ্গে সংপৃক্ত করেই তাকে পেতে হবে। নশ্বর জীবনকে মৃত্যুর পটভূমিতে দেখার একটা অভিলাষ এই উপন্যাসে সক্রিয়। তাই উপন্যাস শুরু হয়েছে একটা নৈর্ব্যক্তিক অসহায় মৃত্যুদৃশ্য দিয়ে। সূচনার এই ধাঁচ বা প্যাটার্ন বাংলা উপন্যাসের পূর্বতন সমস্ত সংস্কারকে বিপর্যস্ত করে দিতে সক্ষম হয়েছে। জীবন সম্পর্কে বোধ এবং উপলব্ধি উপন্যাসটির শেষাংশেও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে সংলাপের মধ্য দিয়ে। যেমন- কুসুমের বাবা অনন্তঃ 'সংসারে মানুষ চায় এক, হয় আর, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল বইতো নই আমরা , একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন ।'[১৩]

আমাদের দেখা প্রকাণ্ড এই জড়প্রকৃতি চৈতন্যের বিরোধী। তার বিরুদ্ধে লড়াই করাই সচেতন মানুষের জীবন। মানুষ লড়াই করে কিন্তু হেরে যায়, হেরে যেতে হয়। তবু মানুষ সজ্ঞানে আত্মসমর্পন করতে নারাজ। শশী ডাক্তারের চিন্তার মধ্য দিয়ে জীবনের প্রতি তার মমতা বড় হয়ে উঠেছে। জীবনটা তার কাছে অতি কাম্য অতি উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, একটা জীবনকে সে যেন এতকাল ঠিকভাবে ব্যবহার করে নাই। মৃত্যু পর্যন্ত অন্যমনস্ক বাঁচিয়া থাকার মধ্যে জীবনের অনেক কিছুই যেন তাহার অপব্যয়িত হইয়া যাইবে। শুধু তাহার নয় সকলের। জীবনের এই ক্ষতি প্রতিকারহীন।
এই জীবনময়তায় কাহিনীর সূচনা এবং জীবনস্রোতকে যে অজানা শক্তি পরিচালনা করছে তার কাছে মানুষের নিত্য পরাজয় চিন্তার মধ্য দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি। শশীর ভাবনাঃ

'কাজ আর দায়িত্ব ছিল জীবনে, কাজ আর দায়িত্বের জীবনটা আবার ভরপুর হইয়া উঠিল। নদীর মতো নিজের খুশীতে গড়া পথে কি মানুষের জীবনের স্রোত বহিতে পারে? মানুষের হাতে কাটা খালে তার গতি, এক অজানা শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিতে। মাধ্যাকর্ষণের মতো, যা চিরন্তন, অপরিবর্তনী।'[১৪] কুসুমের চলে যাওয়াই তাই শশীর মনে হয়- 'মাটির ঢিলাটির উপর উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না। তবুও কাজ আর দায়িত্বে জীবনটা ভরে যায়, শূন্যতা আর রোমান্টিক ভাবাবেগ পরাস্ত হয় '[১৫] উপন্যাসটির এখানেই জীবনময়তার প্রতিষ্ঠা। মানুষ আপন অন্তরালে সবচেয়ে দুর্গম, তার মনের গতি অসরল, কুটিল, তার অভিপ্সা বৃহত্তর জীবনসন্ধান। বিশ্লেষণ ও লিপিকুশলতার সাথে অসাধারণ শিল্প সংযমের পরিচয় আমরা পাই এ উপন্যাসে। আর এই সংযমের প্রকাশ ঘটেছে মানিকের নিরাবেগ ভাষায় ও নিরাসক্ত দৃষ্টিতে।

বিশ বছর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটানা লিখেছেন ৪০ টি উপন্যাস, প্রায় ১৭টি গল্পগ্রন্থ। তাঁর লেখার সময়সীমা ১৯৩৫-৫৬ পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে বহু পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের পৃথক আবাসভূমি হিসাবে দেশ বিভক্ত হয়েছে হিন্দুস্থান পাকিস্থানে। অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য আমরা পাইনি, ব্রিটিশ পুঁজিবাদীর স্থান দখল করেছে ভারতীয় পুজিবাদী, দেশের বহু উন্নতি হয়েছে, এ উন্নতি ও সৃষ্ট সম্পদের সিংহভাগ মুষ্টিমেয় ধণিকের হাতে কুক্ষিগত হয়েছে, মধ্যবিত্ত হয়েছে মেরুদণ্ডহীন, গরীব হয়েছে আরও গরীব, ব্যবধান বেড়েছে শহর ও গ্রামের। অর্থনৈতিক বৈষম্যের কুফল সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে গড়েছে ব্যাপক ভাবে নানা সমস্যা জীবনকে করেছে বিপর্যস্ত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃবৃন্দের ও দলসমূহের ব্যর্থতা এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অন্যায়ের সাথে আপোষপ্রবণতা, ভীরুতা ও এষ্টাবলিশমেন্ট-এর প্রতি সভয় ভক্তি দেখা দিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এরকম পরিস্থিতিতে একজন লেখককে নানা আর্থিক ও সামাজিক সংকটের আবর্তে পড়তে হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই আবর্তে পড়ে দিশেহারা হয়েছেন একথা ঠিক, তবে তিনি

কখনো পালিয়ে যাননি, আত্মপ্রতরণা করেননি। রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে অনেক সংকটলগ্নে অন্যেরা যখন নীরব থেকেছেন, তিনি তখন উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদমুখর হয়েছেন। অন্ততঃ এ কারণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'অন্যায়-বিরোধী আপোস-বিরোধী সৎ লেখক' বলা যায়। [১৬]

নিজের লেখা সম্পর্কে দ্বিধাহীন চিত্তে তিনি বলেছেনঃ- 'আমার লেখায় যে অনেক ভুল ভ্রান্তি আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি আছে আগেও আমি জানতাম। কিন্তু মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে এতটা স্পষ্ট ও আন্তরিকভাবে জানবার সাধ্য হয়নি।' [১৭] তিনি বারংবার অজানা দুঃসাহসিক পরীক্ষার পথে এগিয়েছেন। ছকে ফেলে তিনি জীবনকে দেখেননি। জীবনের রহস্যসন্ধানে তিনি বার বার অভ্যস্ত জীবন যাত্রার শৃঙ্খলকে ছিন্ন করে জীবনপ্রবাহের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছেন। তিনি জীবনকে সমগ্রভাবে ধরতে চেয়েছিলেন। 'জীবনকে তো জানতেই হবে, এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু জীবনকে জানাই যথেষ্ট নয়। সাহিত্য কি এবং কেন সে তত্ত্ব শেখাও যথেষ্ট নয়। যে জীবনকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জেনেছি বুঝেছি সেই জীবনটাই সাহিত্যে কতখানি রূপায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে সেটাও সাহিত্যিককে স্পষ্টভাবে জানতে ও বুঝতে হবে, নইলে নতুন সৃষ্টির প্রেরণাও জাগবে না, পথও মুক্ত হবে না।' [১৮]

জীবনের আপাত সাফল্যের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে একজন মহৎ শিল্পীর মত নিজের সীমা বার বার উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন তিনি এবং উপন্যাসের প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি নিয়ে দুঃসাহসিক পরীক্ষায় আজীবন নিরত ছিলেন-এটাই বোধ হয় মানিক সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় ও নিরপেক্ষ মন্তব্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন আর সাহিত্য ছিল অভিন্ন, এ দু'য়ের মধ্যে কোন ফাঁকি বা প্রতারণা ছিল না-এটাই মানিক সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ''মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকেই সন্ধানী, তাই তাঁর এগিয়ে চলার মধ্যেও থমকে দাঁড়ানো আছে, পিছু হটতেও হয়েছে কখনো কখনো। বলা বাহুল্য, তাঁর এগিয়ে চলা, থমকে দাঁড়ানো ও পিছু হটা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়-এখানেও তিনি অখন্ড অনুসন্ধিৎসারই পরিচয় দিয়েছেন।'' [১৯]
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী D.H.I awrence সম্বন্ধে জনৈক্য পাশ্চাত্য সমালোচকের উক্তি উদ্ধৃত করেছেনঃ

> "His conduct towards his friends and especially to those who tried to help him was cavalier . He made a principale of biting the hands that tried to feed him . And the curious things is that he loved those friends none the less, while they were grateful to accept his abuse." (Richard Church on D. H. Lawrans)

লরেন্স যেমন নাকি শিল্প ও জীবনকে একীভূত করে দেখতে পেরেছিলেন, বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও পেরেছিলেন। শিল্পাদর্শে না হলেও শিল্পের উপকরণে এবং জীবনে অন্তত এ ব্যাপারে লরেন্সের সাথে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বাঙালি সাহিত্যিক, আমাদের শিক্ষাগত নানাপ্রকার পূর্ব সংস্কার এবং চিন্তাগত নানাপ্রকার ভাবালুতা সম্পর্কে যাঁর বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না। সমাজের অবহেলিত মানুষকে নিয়ে তাঁর আগেও অনেকে সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি স্বাতন্ত্র্য বর্তমান। অন্যান্য শিল্পীরা যখন নাকি সাহিত্যের উপকরণ নির্বাচনে চরম দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েও বুদ্ধির আভিজাত্যকে ত্যাগ করতে পারেন নি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত থাকতে পেরেছেন। নীচের তলার মানুষকে তিনি দেখতে চেয়েছেন এবং দেখেছেন, শুধু দেখেছেন যে তাই নয়-সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই প্রথম নীচের তলায় গিয়ে তাদেরকে দেখেছেন। এখানেই তিনি বাংলা সাহিত্যে অনন্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনকে ভালবাসতে চেয়েছিলেন তাঁর আপন পন্থায়।

**তথ্য পঞ্জী:**

১। সেন গুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, 'কল্লোল যুগ' পৃ-৫১

২। ত্রিপুরারী, দীপ্তি, 'আধুনিক উপন্যাস চিন্তা', অনিল সিংহ সম্পাদিত নতুন সাহিত্য। (কলকাতা, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৫) পৃ-১১

৩। অন্বিষ্ট(মাঘ- ১৩৭৮)

৪। মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার, 'কালের প্রতিমা' ১ম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৭৪, কল, পৃ-৫

৫। ঐ পৃ-৫-৬

৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক 'লেখকের কথা' (সাহিত্য করার আগে) পৃ-১৫-১৬

৭। চৌধুরী, নাজমা জেসমিন, 'বাংলা উপন্যাসের রাজনীতি', পৃ-১৬১

৮। ঐ, পৃ-১৬৩

৯। ঐ, পৃ-১৬৫

১০। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, রচনাসমগ্র ৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ৩য় মুদ্রণ, জানুয়ারী ২০১৪, পৃঃ ২৩

১১। ঐ, পৃঃ ৪৭

১২। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'পাথরে ফুল'(কবিতা)

১৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, রচনাসমগ্র ১, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ৪র্থ সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১০, পৃঃ ৪৭১

১৪। ঐ,পৃঃ ৪৯৪

১৫। ঐ,পৃঃ ৪৯৪

১৬। মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার, 'কালের প্রতিমা' ১ম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৭৪, কল, পৃ-৭৬

১৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক 'লেখকের কথা'(সাহিত্য করার আগে)

১৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক 'লেখকের কথা'(সাহিত্য করার আগে)

১৯। রায়, রবীন্দ্রনাথ, 'ভূমিকা মানিক গ্রন্থাবলী ১ম খন্ড (মন ও শিল্প)', কল।